জিলহজের প্রথম দশদিনের ফযীলত এবং ঈদ ও কুরবানীর বিধান

(বাংলা-bengali-البنغالية)

আব্দুল মালেক আল-কাসেম
অনুবাদ : সানাউল্লাহ নজির আহমদ
সম্পাদনা: চৌধুরী আবুল কালাম আজাদ

1430هـ - 2009م

islamhouse.com

﴿ فضل العشر من ذي الحجة وأحكام عيد الأضحى والأضحية ﴾

(باللغة البنغالية)

عبد الملك القاسم

ترجمة : ثناء الله نذير أحمد

مراجعة : أبو الكلام أزاد

2009 - 1430

islamhouse.com

জিলহজ মাসের প্রথম দশদিনের ফযীলত এবং ঈদ ও কুরবানীর বিধান

জিলহজ মাসের দশদিনের ফযীলত :

আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানী যে, তিনি নেককার বান্দাদের জন্য এমন কিছু মৌসুম করে দিয়েছেন, যেখানে তারা প্রচুর নেক আমল করার সুযোগ পায়, যা তাদের দীর্ঘ জীবনে বারবার আসে আর যায়। এসব মৌসুমের সব চেয়ে বড় ও মহত্বপূর্ণ হচ্ছে জিলহজ মাসের প্রথম দশদিন।

জিলহজ মাসের ফযীলত সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের কতক দলীল :

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ وَالْفَجْرِ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ [الفجر:1-2]

কসম ভোরবেলার। কসম দশ রাতের। (সূরা ফাজর : ১-২) ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন : এর দ্বারা উদ্দেশ্য জিলহজ মাসের দশ দিন।

২. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ﴾ [الحج:28]

তারা যেন নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করে। (হজ : ২৮) ইবনে আব্বাস বলেছেন : অর্থাৎ জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন।

৩. ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ দিনগুলোর তুলনায় কোনো আমল-ই অন্য কোন সময় উত্তম নয় । তারা বলল : জিহাদও না ? তিনি বললেন : জিহাদও না, তবে যে ব্যক্তি নিজের জানের শঙ্কা ও সম্পদ নিয়ে বের হয়েছে, অতঃপর কিছু নিয়েই ফিরে আসেনি। (বুখারী)

৪. ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নিকট কোন দিন প্রিয় নয়, আর না তাতে আমল করা, এ দশ দিনের তুলনায়। সুতরাং তাতে তোমরা বেশী করে তাহলীল, তাকবীর ও তাহমীদ পাঠ কর। (তাবারানী ফীল মুজামিল কাবীর)

৫. সাঈদ ইবনে জুবায়ের রাহিমাহুল্লাহর অভ্যাস ছিল, যিনি পূর্বে বর্ণিত ইবনে আব্বাসের হাদীস বর্ণনা করেছেন : যখন জিলহজ মাসের দশ দিন প্রবেশ করত, তখন তিনি খুব মুজাহাদা করতেন, যেন তার উপর তিনি শক্তি হারিয়ে ফেলবেন। (দারামী, হাসান সনদে)

৬. ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন : জিলহজ মাসের দশ দিনের ফযীলতের তাৎপর্যের ক্ষেত্রে যা স্পষ্ট, তা হচ্ছে এখানে মূল ইবাদাতগুলোর সমন্বয় ঘটেছে। অর্থাৎ সালাত, সিয়াম, সাদকা ও হজ, যা অন্যান্য সময় আদায় করা হয় না। (ফাতহুল বারী)

৭. উলামায়ে কেরাম বলেছেন : জিলহজ মাসের দশদিন সর্বোত্তম দিন, আর রমযান মাসের দশ রাত, সব চেয়ে উত্তম রাত।

এ দিনগুলোতে যেসব আমল করা মুস্তাহাব :

১. সালাত : ফরয সালাতগুলো দ্রুত সম্পাদন করা, বেশী বেশী নফল আদায় করা। যেহেতু এগুলোই আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার সর্বোত্তম মাধ্যম। সাওবান রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শোনেছি : তুমি বেশী বেশী সেজদা কর, কারণ তুমি এমন কোন সেজদা কর না, যার কারণে আল্লাহ তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন না এবং তোমরা গুনা ক্ষমা করেন না। (মুসলি) এটা সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য।

২. সিয়াম : যেহেতু অন্যান্য নেক আমলের মধ্যে সিয়ামও অন্যতম, তাই এ দিনগুলোতে খুব যত্নের সাথে সিয়াম পালন করা। হুনাইদা বিন খালেদ তার স্ত্রী থেকে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিলহজ মাসের নয় তারিখ, আশুরার দিন ও প্রত্যেক মাসের তিন দিন রোজা পালন করতেন। (ইমাম আহমদ. আবূদাউদ ও নাসায়ী) ইমাম নববী জিলহজ মাসের শেষ দশ দিনের ব্যাপারে বলেছেন, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব।

৩. তাকবীর, তাহলীল ও তাহমীদ : পূর্বে ইবনে ওমরের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : তাতে রয়েছে, তোমরা বেশী বেশী তাকবীর, তাহলীল ও তাহমীদ পড়। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ইবনে ওমর ও আবূহুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহুমা এ দশ দিন তাকবীর বলতে বলতে বাজারের জন্য বের হতেন, মানুষরাও তাদের দেখে দেখে তাকবীর বলত। তিনি আরো বলেছেন, ইবনে ওমর মিনায় তার তাবুতে তাকবীর বলতেন, মসজিদের লোকেরা তা শুনত, অতঃপর তারা তাকবীর বলত এবং বাজারের লোকেরাও, এক পর্যায়ে পুরো মিনা তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠত।

ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু এ দিনগুলোতে মিনায় তাকবীর বলতেন, প্রত্যেক সালাতের পর, বিছানায়, তাঁবুতে, মজলিসে ও চলার পথে। স্বশব্দে তাকবীর বলা মুস্তাহাব। যেহেতু ওমর, ইবনে ওমর ও আবূহুরায়রা স্বব্দে তাকবীর বলেছেন।

মুসলমান হিসেবে আমাদের উচিত, এ সুন্নতগুলো জীবিত করা, যা বর্তমান যুগে প্রায় পরিত্যক্ত এবং ভুলে যাওয়ার উমক্রম হয়েছে, এমনকি নেককার লোকদের থেকেও, অথচ আমাদের পূর্বপুরুষগণ এমন ছিলেন না।

৪. আরাফার দিন রোজা : হাজী ছাড়া অন্যদের জন্য আরাফার দিনের রোজা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত, তিনি আরাফার দিনের রোজার ব্যাপারে বলেছেন : আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী, ইহা পূর্ববর্তী এক বছর ও পরবর্তী এক বছরের গুনার কাফফারা হবে। (মুসলিম)

৫. নহরের দিন তথা দশই জিলহজের ফযীলত : এ দিনগুলোর ব্যাপারে অনেক মুসলমানই গাফেল, অথচ অনেক আলেমদের নিকট নিঃশর্তভাবে এ দিনগুলো উত্তম, এমনকি আরাফার দিন থেকেও। ইবনুল কাইয়ূম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন : আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম দিন, নহরের দিন। আর তাই হজ্জে আকবারের দিন। যেমন সুনানে আবূদাউদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় দিন হলো নহরের দিন, অতঃপর মিনায় অবস্থানের দিন। অর্থাৎ এগারোতম দিন। কেউ কেউ বলেছেন : আরাফার দিন তার থেকে উত্তম। কারণ, সে দিনের সিয়াম দুই বছরের গুনার কাফফারা। আল্লাহ আরাফার দিন যে পরিমাণ লোক জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন, তা অন্য কোন দিন করেন না। আরো এ জন্যও যে, আল্লাহ তাআলা সে দিন বান্দার নিকটবর্তী হন এবং আরাফায় অবস্থানকারীদের নিয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন। তবে প্রথম বক্তব্যই সঠিক : কারণ, হাদীস তারই প্রমাণ বহন করে, এর বিরোধী কিছু নেই। যাই হোক, উত্তম হয় আরাফার দিন নয় মিনার দিন, হাজী বা বাড়িতে অবস্থানকারী সবার উচিত সে দিনের ফযীলত অর্জন করা এবং তার মুর্হূতগুলো থেকে উপকৃত হওয়া।

ইবাদাতের মৌসুমগুলো আমরা কিভাবে গ্রহণ করব ?

প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য ইবাদাতের মৌসুমগুলোতে বেশী বেশী তাওবা করা। গুনা ও অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা। কারণ, গুনা মানুষকে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত রাখে। গুনা ব্যক্তির অন্তর ও আল্লাহর মাঝে বাঁধার সৃষ্টি করে। বান্দার আরো উচিত কল্যাণকর ও শুভদিনগুলোতে এমন সব আমল ও কাজে নিয়োজিত থাকা, যা আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ। যে আল্লাহর সাথে সত্যতার প্রমাণ দেবে আল্লাহও তার সাথে তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়ন করবেন। তিনি বলেন :

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت:69]

আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্ট চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। (আনকাবূত : ৬৯)

তিনি অন্যত্র বলেন :

﴿ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران:133].

আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাঘফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (আলে-ইমরান : ১৩৩)

হে মুসলিম ভাই, এ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোর জন্য সজাগ থাক, তার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখ, তা যেন কোনভাবেই তোমার থেকে অবহেলায় অতিবাহিত না হয়। ফলে তুমি লজ্জিত হবে, কিন্তু তোমার লজ্জা সেদিন কোন কাজে আসবে না। কারণ, দুনিয়া ছায়ার ন্যায়। আজকে আমরা কর্মস্থলে অবস্থান করছি আগামিকাল অবস্থান করব প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশের দিবসে, জান্নাত কিংবা জাহান্নামে। তুমি তাদের মত হও, এ আয়াতে আল্লাহ যাদের উল্লখ করেছেন :

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ [الأنبياء:90].

তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত। আর আমাকে আশা ও ভীতি সহকারে ডাকত। আর তারা ছিল আমার নিটক বিনয়ী। (আম্বিয়া : ৯০)

ঈদুল আজহার বিধান :

মুসলিম ভাই, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করছি যে, তিনি তোমাকে দীর্ঘ জীবি করেছেন, যার ফলে তুমি আজকের এ দিনগুলোতে উপনীত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার জন্য ইবাদাত ও নেকআমল করার সুযোগ পেয়েছ।

ঈদ এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য এবং দীনের একটি উজ্জল নিদর্শন। তোমার দায়িত্ব এটা গুরুত্ব ও সম্মানসহ গ্রহণ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج:32].

এটাই হল আল্লার বিধান; যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়া থেকেই। (হজ : ৩২)

ঈদের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত কিছু আদব ও আহকাম :

১. তাকবীর : আরাফার দিনের ফজর থেকে শুরু করে তাশরীকের দিনের শেষ পর্যন্ত, তথা জিলহজ মাসের তের তারিখের আসর পর্যন্ত তাকবীর বলা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ﴾ [البقرة:203]

আর তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর নির্দিষ্ট দিনসমূহে। (বাকারা : ২০৩)

তাকবীর বলার পদ্ধতি :

" الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد "

আল্লাহর যিকির বুলন্দ ও সর্বত্র ব্যাপক করার নিয়তে পুরুষদের জন্য মসজিদে, বাজারে, বাড়িতে ও সালাতের পশ্চাতে উচ্চ স্বরে তাকবীর পাঠ করা সুন্নত।

২. কুরবানী করা : ঈদের দিন ঈদের সালাতের পর কুরবানী করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

{ من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح } [رواه البخاري ومسلم].

যে ব্যক্তি ঈদের আগে যবেহ করল, তার উচিত তার জায়গায় আরেকটি কুরবানী করা। আর যে এখনো কুরবানী করেনি, তার উচিত এখন কুরবানী করা। (বুখারী ও মুসলিম) কুরবানী করার সময় চার দিন। অর্থাৎ নহরের দিন এবং তার পরবর্তী তাশরীকের তিন দিন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

{ كل أيام التشريق ذبح } [انظر السلسلة الصحيحة برقم 2467].

তাশরীকের দিন কুরবানীর দিন। (সহীহ হাদীস সমগ্র : ২৪৬৭)

৩. পুরুষদের জন্য গোসল করা ও সুগন্ধি মাখা : সুন্দর কাপড় পরিধান করা, টাকনার নিচে কাপড় পরিধান না করা, কাপড়ের ক্ষেত্রে অপচয় না করা। দাঁড়ি না মুণ্ডানো, এটা হারাম। নারীদের জন্য ঈদগাহে যাওয়া বৈধ, তবে আতর ও সৌন্দর্য প্রদর্শন পরিহার করে। মুসলিম নারীদের জন্য কখনো শোভা পায় না যে, সে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য তাঁরই গুনাতে লিপ্ত হয়ে ধর্মীয় কোন ইবাদাতে অংশ গ্রহণ করবে। যেমন সৌন্দর্য প্রদর্শন, সুসগন্ধি ব্যবহার ইত্যাদি করে ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া।

৪. কুরবানীর গোস্ত ভক্ষণ করা। ঈদুল আজহার দিন রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা খেতেন না, যতক্ষণ না তিনি ঈদগাহ থেকে ফিরে আসতেন, অতঃপর তিনি কুরবানী গোস্ত থেকে ভক্ষণ করতেন।

৫. সম্ভব হলে ঈদগাহে হেঁটে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া : ঈদগাহতেই সালাত আদায় করা সুন্নত। তবে বৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে মসজিদে পড়া বৈধ, যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পড়েছেন।

৬. মুসলমানদের সাথে সালাত আদায় করা এবং খুতবায় অংশ গ্রহণ করা : উলামায়ে কেরামদের প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, ঈদের সালাত ওয়াযিব। এটাই ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر:2].

অতএব তোমরা রবের উদ্দেশ্যেই সালাত পড় এবং নহর কর। (কাউসার : ২)

উপযুক্ত কোন কারণ ছাড়া ঈদের সালাতের ওয়াজিব রহিত হবে না। মুসলমানদের সাথে নারীরাও ঈদের সালাতে হাজির হবে। এমনকি ঋতুবতী নারী ও যবতী মেয়েরা। তবে ঋতুবতী নারীরা ঈদগাহ থেকে দূরে অবস্থান করবে।

৭. রাস্তা পরিবর্তন করা : এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যাওয়া ও অপর রাস্তা দিয়ে ঈদগাহ থেকে বাড়ি ফেরা মুস্তাহাব। যেহেতু তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম করেছেন।

৮. ঈদের সুভেচ্ছা জানানো : ঈদের দিন একে অপরকে সুভেচ্ছা বিনিময় করা : যেমন বলা :

تقبل الله منا ومنكم. أو تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

অর্থ : আল্লাহ আমাদের থেকে ও তোমাদের থেকে নেকআমলসমূহ কবুল করুন। বা এ ধরণের অন্য কিছু বলা।

এ দিনগুলোতে সাধারণ ঘটে যাওয়া কিছু বেদআত ও ভুল ভ্রান্তি থেকে সকলের সতর্ক থাকা জরুরী : যেমন :

১. সম্মিলিত তাকবীর বলা : এক আওয়াজে অথবা একজনের বলার পর সকলের সমস্বরে বলা থেকে বিরত থাকা।

২. ঈদের দিন হারাম জিনিসে লিপ্ত হওয়া : গান শোনা, ফিল্ম দেখা, বেগানা নারী-পুরুষের সাথে মেলামেশা করা ইত্যাদি পরিত্যাগ করা।

৩. কুরবানী করার পূর্বে চুল, নখ ইত্যাদি কর্তন করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানী দাতাকে জিলহজ মাসের আরম্ভ থেকে কুরবানী করা পর্যন্ত তা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

৪. অবপচয় ও সীমালঙ্ঘন করা : এমন খরচ করা, যার পিছনে কোন উদ্দেশ্য নেই, যার কোন ফায়দা নেই, আর না আছে যার কোন উপকার। আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

﴿ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام:141].

আর তোমরা অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না। (আনআম : ১৪১)

করবানীর বৈধতা ও তার কতক বিধান :

কুরবানীর অনুমোদনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন।

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر:2]

অতএব তোমরা রবের উদ্দেশ্যেই সালাত পড় এবং নহর কর। (কাউসার : ২)
তিনি আরো বলেন :

﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ [الحج:36]،

আর কুরবানীর উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন বানিয়েছি। (হজ : ৩৬)
কুরবানী সুন্নতে মুয়াক্কাদা। সামর্থ থাকা সত্বে তা ত্যাগ করা মাকরুহ। আনাস রাদিআল্লাহু আনহুর হাদীসে রয়েছে, যা বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন :

أن النبي – صلى الله عليه وسلم – ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরতাজা ও শিং ওয়ালা দুটি মেষ নিজ হাতে যবেহ করেছেন এবং তিনি তাতে বিসমিল্লাহ ও তাকবীর বলেছেন।

কুরবানীর পশু : উঠ, গরু ও বকরী ছাড়া কুরবানী শুদ্ধ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾[الحج:34].

যাতে তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে, যেসমস্ত জন্তু তিনি রিযক হিসেবে দিয়েছেন তার উপর। (হজ : ৩৪)

কুরবানী শুদ্ধ হওয়ার জন্য ত্রুটি মুক্ত পশু হওয়া জরুরী :

قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: { أربعة لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي } [رواه الترمذي].

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুরবানীর পশুতে চারটি দোষ সহনীয় নয় : স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট অসুস্থ্য, হাড্ডিসার ও ল্যাংড়া পশু। (তিরমিযী : কিতাবুল হজ : ৩৪)

যবেহ করার সময় : ঈদের সালাতের পর কুরবানীর সময় শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

{ من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب السنة } [متفق عليه].

যে সালাতের পূর্বে যবেহ করল, সে নিজের জন্য যবেহ করল। আর যে খুতবা ও ঈদের সালাতের পর কুরবানী করল, সে তার কুরবানী ও সুন্নত পূর্ণ করল। (বুখারী ও মুসলিম)

যে সুন্দর করে যবেহ করার ক্ষমতা রাখে তার উচিত নিজ হাতে কুরবানী করা। কুরবানীর সময় বলবে :

بسم الله والله أكبر، اللّٰهُمَّ هذا عن فلان

কুরবানীকারী নিজের নাম বলবে অথবা যার পক্ষ থেকে করবানী করা হচ্ছে তার নাম বলবে । যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

{ بسم الله والله أكبر، اللّٰهُمَّ هذا عني وعن من لم يُضح من أمتي }[رواه أبو داود والترمذي]،

বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার; হে আল্লাহ, এটা আমার পক্ষ থেকে এবং আমার উম্মতের মধ্যে যারা কুরবানী করেনি, তাদের পক্ষ থেকে। (আবূদাউদ ও তিরমিযী)

কুরবানীর গোস্ত ভন্টন করা : কুরবানী পেশকারী ব্যক্তির জন্য সুন্নত হচ্ছে কুরবানীর গোস্ত নিজে খাওয়া, আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের হাদিয়া দেয়া এবং গরীবদের সদকা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ [الحج:28]

অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুস্থ-দরিদ্রকে থেকে দাও। (হজ : ২৮)

তিনি আরো বলেন :

﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ [الحج:36]

তখন তা থেকে খাও। যে অভাবী, মানুষের কাছে হাত পাতে না এবং যে অভাবী চেয়ে বেড়ায়-তাদেরকে খেতে দাও। (হজ : ৩৬)

পূর্বসূরীদের অনেকের পছন্দ হচ্ছে, কুরবানীর গোস্ত তিনভাগে ভাগ করা। এক তৃতীয়াংশ নিজের জন্য রাখা। এক তৃতীয়াংশ ধনীদের হাদীয়া দেয়া। এক তৃতীয়াংশ ফকীরদের জন্য সদকা করা। পারিশ্রমিক হিসেবে এখান থেকে কসাই বা মজদুরদের কোন অংশ প্রদান করা যাবে না।

কুরবানী পেশকারী যা থেকে বিরত থাকবে : যখন কেউ কুরবানী পেশ করার ইচ্ছা করে আর জিলহজ মাস প্রবেশ করে, তার জন্য চুল, নখ অথবা চামড়ার কোন অংশ কাটা হারাম, যতক্ষণ না কুরবানী করে। উম্মে সালমার হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

{ إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره } [رواه أحمد ومسلم]، وفي لفظ: { فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً حتى يضحي }

যখন জিলহজ মাসের দশ দিন প্রবেশ করে এবং তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করে, সে তখন থেকে চুল ও নখ কর্তন থেকে বিরত থাকবে। ইতিপূর্বে যা কর্তন করেছে, সে জন্য তার কোন গুনা হবে না।

কুরবানী দাতার পরিবারের লোক জনের নখ, চুল ইত্যাদি কাঁটাতে কোন সমস্যা নেই।

কোন কুরবানী তাদা যদি তার চুল, নখ অথবা চামড়ার কোন অংশ কেঁটে ফেলে, তার জন্য উচিত তাওবা করা, পুনরাবৃত্তি না করা, তবে এ জন্য কোন কাফফারা নেই এবং এ জন্য কুরবানীতে কোন সমস্যা হবে না। আর যদি ভুলে, অথবা না জানার কারণে অথবা অনিচ্ছাসত্বে কোন চুল পড়ে যায়, তার কোন গুনা হবে না। আর যদি সে কোন কারণে তা করতে বাধ্য হয়, তাও তার জন্য জায়েয, এ জন্য তার কোন কিছু প্রদান করতে হবে না। যেমন নখ ভেঙ্গে গেল, ভাঙ্গা নখ তাকে কষ্ট দিচ্ছে, সে তা কর্তন করতে পারবে, তদ্রূপ কারো চুল বেশী লম্বা হয়ে চোখের উপর চলে আসছে, সেও চুল কাঁটতে পারবে অথবা কোন চিকিৎসার জন্যও চুল ফেলতে পারবে।

মুসলিম ভাইদের প্রতি আহব্বান : আপনারা উপরে বর্ণিত নেকআমল ছাড়াও অন্যান্য নেকআমলের প্রতি যত্নশীল হোন। যেমন আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা, হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করা, একে অপরকে মহব্বত করা এবং গরীব ও ফকীরদের উপর মেহেরবান হওয়া এবং তাদের আনন্দ দেয়া ইত্যাদি।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি আমাদেরকে তাঁর পছন্দনীয় কথা, কাজ ও আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সমাপ্ত